সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৮

শামসুর রাহমানের উপন্যাস : মধ্যবিত্তের জীবনবোধ

মো. আবদুস সোবহান তালুকদার*

সার-সংক্ষেপ : শামসুর রাহমান নাগরিক জীবনের ভাষ্যকার। মূলত কবি হলেও তাঁর উপন্যাস পাঠকের নজর কাড়ে। তিনি বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন-সংকটকে উপন্যাসের বিষয় করেছেন। ব্যক্তি, তার সাংসারিক সংকট, রাষ্ট্রীয় জীবনাচারে ব্যক্তির বিকাশ, সমাজ-পরিসরে ব্যক্তির বিচরণ – এইসব বিষয় তিনি খুব সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন কাহিনিতে। মানসিক দ্বন্দ্ব এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তারও প্রতিফলন রয়েছে রাহমানের উপন্যাসগুলোতে। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের নগরজীবনে মধ্যবিত্তের সংকট, বিশেষ করে ঢাকার জনজীবন ও বিশেষ এক অর্থনৈতিক শ্রেণির সামাজিক-মানসিক সংঘাত ও চিন্তার বিকাশধারাকে তিনি ধারণ করেছেন কথা-কাহিনিতে। তাঁর উপন্যাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা হলো – প্রবল আশাবাদ; হতাশার মধ্যেও টিকে থাকার তাড়না তাঁর এই আশাবাদের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

উপন্যাসের সঙ্গে আধুনিক নগর ও নগরে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। মধ্যবিত্তের উদ্ভবের জন্য যে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার বিবর্তন আবশ্যক, উপন্যাসের জন্যও তা অপরিহার্য। মানব বিকাশের বিশেষ কাল পর্বেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও উপন্যাসের আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে। সাহিত্য-শিল্পের বিভিন্ন শাখার যেরূপ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সেরূপ জীবন সংলগ্নতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেননা সাহিত্য-শিল্প তো পৃথিবী বিচ্ছিন্ন বায়বীয় কোনো একটা বিশেষ কিছু নয়। মানব সমাজকে কেন্দ্র করে জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড ও অন্তর্লোকের নানা টানাপড়েন নিয়ে গড়ে ওঠে সাহিত্য। নিও-ক্রিটিসিজম মতাদর্শ বা সাহিত্যতত্ত্ব অনুযায়ী সাহিত্য হলো 'সৃষ্টিশীল রহস্যময় কর্ম'। (আকতার কামাল ২০১৩ : ৩৩৫) জীবন-সংলগ্নতা উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য হওয়ায় সমাজের নানা শ্রেণির জীবন বাস্তবতা ও চারিত্রিক বৈচিত্র্যময়তা উপন্যাসে উন্মোচিত হওয়া স্বাভাবিক। আমরা দেখি বাংলাদেশে উপন্যাস শিল্পরূপের চর্চা নাগরিক মধ্যবিত্ত লেখকদের মাধ্যমে। অতএব উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নাগরিক মানুষের ব্যক্তিক ও শ্রেণিগত জীবন জিজ্ঞাসা, পারিপার্শ্বিকতার সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব সংঘাত, তার ঐতিহ্যানুসন্ধান ও ইতিহাসচেতনা এবং

---

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i3.4

তার জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশচেতনা কীভাবে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে, তা বিশ্লেষিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে প্রায় সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মূল্যবোধের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়। বাংলাদেশেও এই রূপান্তর ও পরিবর্তন সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। যুদ্ধোত্তর ক্ষয়িষ্ণু মানসিকতা, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার স্পৃহা, সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের সংঘাত ভারতবর্ষের মতো বাংলাদেশের উপন্যাসেও আলোড়ন তোলে ও প্রভাব ফেলে –

> রক্তাক্ত দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তুস্রোত আমাদের বাঙালি সমাজের সব সংস্থিতি নষ্ট করে দিয়েছে। বস্তুত এই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত (ভারত-বিভাগ ও বাংলা-বিভাগ) আমাদের ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। তবু আজ পর্যন্ত এই সমস্যা নিয়ে কোন মহৎ উপন্যাস বাংলায় লেখা হল না। গত তিরিশ বছরের বাংলা উপন্যাস লেখকেরা এদিক থেকে আশ্চর্য নিরব ভূমিকা পালন করে চলেছেন। (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৫ : ২৬০)

তারই অনিবার্য পরিণতিতে ঔপন্যাসিকদের মানসচেতনায় ও মূল্যবোধে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আর এরই প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের উপন্যাসেও নতুন যাত্রা যোগ হয়।

> সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রে ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'পাকিস্তান' নামক কৃত্রিম রাষ্ট্রের শৃঙ্খলে পূর্ববঙ্গের উঠতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অগ্রযাত্রা হয় বাধাপ্রাপ্ত। পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব বাংলায় উঠতি পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং নব জাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণি অনুভব করে তাদের অস্তিত্বের অনুসংকট। পাকিস্তানি বৃহৎ পুঁজির স্বার্থেই পূর্ব বাংলায় রূপান্তরিত হলো আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক একটা অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে সমাজ বিকাশের এই প্রতিবন্ধকতা শিল্পীর চৈতন্যকে অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করল। (বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০০৯ : ১১-১২)

আর এই প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তির জন্য ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সংঘটিত হয় ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভাষা আন্দোলন। ৫২-এর রক্তিম প্রতিবাদ যেমন পূর্ববাংলার জনমনে তোলে বর্ণিল আলোড়ন, তেমনি সামন্ত মূল্যবোধের লালিত মধ্যবিত্তের সুদৃঢ় ভিতকে করে মানবতাবাদে সিক্ত ।

১৯৪৭-১৯৫৭ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের পূর্বকাল ও পরবর্তী সময় এদেশের সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পর্যায়। এই পর্যায়ে রচিত উপন্যাসসমূহকে বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রথম পর্ব বলে বিবেচনা করা যায়। সময়ের এই পর্ব বিভাজন মোটেও আরোপিত নয় বরং সাতচল্লিশোত্তর পূর্ব বাংলার আর্থ সামাজিক বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিভাজন স্বাভাবিকভাবেই সমাজবাস্তবতা সম্মত। 'দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব-পাকিস্তানের নতুন উপন্যাস লেখক দেখা যায়নি। বিভাগ-পূর্বকাল থেকে যাঁরা লিখেছেন, তারাই ছিলেন প্রথম

দিকের ঔপন্যাসিক।'[৪] (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পূর্বোক্ত : ২৯৩) দেশবিভাগ-উত্তরকালে প্রথম দশকে উপন্যাস রচনায়যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ, কাজী ইমদাদুল হক, আবু ইসহাক, আবু রুশদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সরদার জয়েনউদ্‌দীন, শওকত ওসমান, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আবদুল গাফফার চৌধুরী, শওকত আলী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে প্রকাশিত উপন্যাসসমূহ গ্রামকেন্দ্রিক ঘটনাংশকে আশ্রয় করে নির্মিত। '১৯৪৭ সালে প্রকৃতপক্ষে পূর্ববাংলায় কোন নগর ছিল না, ১৯৭১ পর্যন্ত নগরায়নের হারও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।' (ভূঁইয়া ইকবাল ১৯৯১ : ১৪) ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে ঢাকা শহরের নগরায়ণ হয় বিলম্বিত। ফলে শিল্প-সাহিত্যে নাগরিক চেতনার অনুপ্রবেশও হয় বিলম্বিত। 'ঢাকার বিপরীতে কলকাতা ছিল সারা বাংলার প্রধান শহর। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার উপর চর্চা হয়েছে বেশি। ইদানীং ঢাকা শহর নিয়েও সাধারণ পাঠক ও গবেষকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে একটি স্বাধীন দেশের রাজধানী বিধায় এ আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে হয়।' (মুনতাসির মামুন ২০০০ : ভূমিকা) তবুও সীমিত হলেও লেখকদের শিল্পকর্মে নাগরিক চেতনার প্রতিভাসে অনুরণিত হয়েছে, মধ্যবিত্তের জীবন-যন্ত্রণা, নগর-জীবনের ব্যক্তি-আর্তনাদ, সামূহিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ব্যবধান।

১৯৫৮ সাল থেকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে রচিত উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি যেমন বিচিত্রমুখী এবং বৈচিত্র্যসঞ্চারণী তেমনি এ পর্বে আবির্ভূত ঔপন্যাসিকের সংখ্যাও আশাব্যঞ্জক। এ পর্বকে বাংলাদেশের উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ সময় যেসব ঔপন্যাসিকের আগমন ঘটেছে তাদের লেখায় দেশ-বিভাগ, ৫২-র ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৮ পরবর্তী সামরিক শাসন ও পঞ্চম দশকের আইউব খানের একনায়কতান্ত্রিক অপশাসনের আভাস পাওয়া যায়। এ যুগের উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকরা হচ্ছেন – সত্যেন সেন, শহীদুল্লা কায়সার, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, রাজিয়া খান, জহির রায়হান, রশীদ করিম, আহসান হাবীব, আনোয়ার পাশা, নীলিমা ইব্রাহিম, দিলারা হাশেম, আহমদ ছফা, শহীদ আখন্দ প্রমুখ। এদের অধিকাংশ রচনায় উপস্থাপিত হয়েছে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অতলগামী ক্ষয়িষ্ণুতা।

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ প্রক্রিয়া সূচনালগ্ন থেকেই সমাজবিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম থেকে ব্যতিক্রমধর্মী। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরও স্বাধীনতা পূর্বকালের মতো স্বাধীনতা-উত্তরকালেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে থেকে যায় কিছু অপূর্ণতা। থেকে যায় অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। সমষ্টি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিচিত্তের যুগযন্ত্রণা, আত্মরতি ও স্বপ্নভঙ্গের ট্রাজেডি এবং ব্যক্তিগত উপভোগ চেতনার যোগফল হচ্ছে মধ্যবিত্তের জীবন –

> রাজনৈতিক ও সমাজনীতির দিক থেকে বিড়ম্বনা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে কমেনি বরং বেড়েছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ অদ্ভুত এক আঁধারে তলিয়ে যেতে থাকে।

> শুধু দারিদ্র্য নয় বঞ্চনা ও বিত্তহীনতার এক চরম রূপ পরিগ্রহ করে। মানুষ হারায় তার মূল্যবোধ, বিশ্বাস, নিজস্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার। বঞ্চনার শিকার হয় নারী, শিশু, কিশোর, নগর ও গ্রামের সাধারণ মানুষেরা। এই সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি ক্রমাগত ভেঙে পড়েছে, অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈষম্য বিস্তৃততর হয়েছে। (আমিনুর রহমান সুলতান ২০০৩ : ২৮)

আবহমান কালের নিম্নবিত্ত শ্রেণি ক্রমাগত আর্থিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজে অবতীর্ণ হয়েছে। 'বাংলার পূর্বাঞ্চলের মধ্যবিত্তের দ্বিধান্বিত অভিযাত্রা শুরু হয় বিশ শতকের তৃতীয় দশকে।' (ফজলুল হক সৈকত ২০১৭ : ৩১) তাতে পিষ্ট হয়েছে ব্রিটিশ শাসকদের কালো শাসন, পাকিস্তানের একচোখা নির্যাতন ও শোষণনীতি। যেমন 'বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ প্রক্রিয়া সূচনালগ্ন থেকেই সমাজবিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম থেকে ব্যতিক্রমধর্মী।' (রফিকউল্লাহ খান ১৯৯৭ : ২৬৬) তেমনিভাবে পাকিস্তান আমলের দুর্দশাগ্রস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতে বিদীর্ণ। স্বপ্ন ছিল রঙিন। বাস্তব ছিল কাঁটা বিদ্ধ গোলাপের মতো জটিল। তবুও মানুষ স্বপ্ন বেঁধেছে সুখের আশায়। চিন্তায় লালন করেছে সোনালি ভবিষ্যৎ। যেমন স্বপ্ন ছিল ১৯৬৬ সালের ছয়দফা ঘোষণার মাঝে। 'এই ঘোষণা ছিল পাকিস্তানিরাষ্ট্রকাঠামোর অধীনে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ দাবী।' (মইদুল হাসান ১৯৮৬ : ১) যা রূপান্তর ঘটে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশ নামকরণের মধ্য দিয়ে। পূর্ববঙ্গের মানুষ ফিরে পেতে চায় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র। শুরু হয় যুদ্ধ। সাধারণ মানুষের যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ স্বপ্ন দেখে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মুক্তি ঘটবে। যুদ্ধ শেষ হলো নয় মাস পর। উদিত হলো নতুন সূর্য। জাতি অর্জন করলো একটি পতাকা। সার্বভৌমত্ব এবং নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা। উদীয়মান জাতি হিসেবে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণি নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, নতুন কিছু পাবার আশায়। সব থেকে বড় পাওয়া হলো রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা। মানুষ স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসী। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার মুখ বেশিদিন সইতে পারেনি। দুষ্কৃতিকারীর ষড়যন্ত্রে রাষ্ট্র ক্ষমতা হারায় স্বাধীনতা অর্জনকারী জননেতা। শুরু হয় অস্থিরতা এবং সর্বত্রই অস্থিরতা। মধ্যবিত্তের বাস্তহারা হবার ভয়, চাকুরি হারানোর ভয়। সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে দেশ বিরোধী সহযোগী শক্তির ক্রম উত্থান, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মূল্যবোধসমূহের ক্রম বিলুপ্ত, সমাজ গতিকেই যেন পশ্চাদমুখী করে দেয়। অধিকাংশ ঔপন্যাসিক যুদ্ধোত্তর হতাশা-অবক্ষয় আর নৈরাজ্যের শব্দরূপ নির্মাণে সচেষ্ট হলেন; উৎসাহী হলেন যন্ত্রণাদগ্ধ তারুণ্যের নষ্ট জীবনের শিল্পমূর্তি সৃজনে। শিক্ষা, রাজনীতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে অব্যাহত বিশৃঙ্খলা বাংলাদেশের তরুণমানসকে নৈরাজ্য ও শূন্যতাবোধে নিক্ষেপ করে। মধ্যবিত্ত মানুষকে নাড়া দেয় চিন্তার শিকড়ে। তাঁরা জানে সেনাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রশাসিত সমাজে রাজনীতির লক্ষ্য মানব কল্যাণ নয়; রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বার্থ সংরক্ষণ। স্বাধীনতা-উত্তর স্বৈরশাসনে নাগরিক মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের যে রূপান্তর ঘটে, তা কেবল ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নয় – সমগ্র জাতির চিন্তায়তার প্রতিফলন ঘটেছে।

শামসুর রাহমানের উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে নগরজীবনে নগরযন্ত্রণায় দগ্ধ বিচিত্র পেশার মানুষ, বিচিত্র জীবন সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পলায়ন প্রবণতা ও কুণ্ডলায়িত দৃষ্টিভঙ্গি। শহরে কর্মব্যস্ত জীবনে নাগরিকদের সামাজিক দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতাবোধ, ধনী-দরিদ্রের প্রবল বৈষম্য, আবাসন সংকট, ধর্মীয় প্রভাব হ্রাস, উন্নত জীবনের মোহ এবং নাগরিক গার্হস্থ্য জীবনে যুক্তিবোধ ও রূঢ় বাস্তবতা শামসুর রাহমানে উপন্যাসের বিষয়-আশয়। বিকলাঙ্গ সমাজের আত্মশক্তিতে আস্থাহীন অসংবদ্ধ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ক্রমবিকাশের স্তরগুলো নানামাত্রিক আর্থ-সামাজিক সংকটের অভিঘাতে নাগরিক মধ্যবিত্ত পরিবার জীবনে নানামুখী সংকট ব্যক্তিকে অস্থির, দ্বিধান্বিত ও সংশয়গ্রস্ত করে। নিম্নবিত্ত হতে চায় মধ্যবিত্ত আর মধ্যবিত্ত হতে চায় উচ্চবিত্ত। নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে দেখা দেয় নৈতিক স্খলনজনিত আচরণ। মধ্যবিত্তের দ্বিধাদীর্ণ, সুবিধাবাদী চরিত্রের সর্বোগ্রাসী রূপ কবিকে 'রূপালি শহরের উদ্ভাসনে'র মধ্যে টেনে নিয়ে বেড়ায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক প্রভাব ব্যক্তিকে নির্মাণ করেছে নতুনভাবে। ফলে ব্যক্তির নাগরিক জীবনের অনুভূতি, জীবনদৃষ্টি এবং জীবন-সংস্কৃতির রূপান্তর ও নবায়ন ঘটেছে।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে শামসুর রাহমানের উপন্যাসগুলোতে প্রতিফলিত মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-জিজ্ঞাসা অন্বেষার চেষ্টা করবো। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি উপন্যাসকে আলাদাভাবে বিবেচনায় নেয়া হবে।

অক্টোপাস

শামসুর রাহমানের *অক্টোপাস* উপন্যাসটি নাগরিক মধ্যবিত্ত প্রতিবেশ ভাবনায় রচিত। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সামরিক শাসনের হস্তক্ষেপের সঙ্গে ঢাকা শহরের নগর ও নাগরিকের আর্থিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত মানুষের অস্থির জীবনাচারের তিক্ত, বিবর্ণ মানসসত্তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। *অক্টোপাস* উপন্যাসের নায়ক ইশতিয়াক হোসেন। সে পেশায় একজন লেখক আর্থিক প্রয়োজনে চাকুরি করে। উপন্যাসে অন্যান্য চরিত্রের মাঝে রয়েছেন, ইশতিয়াক হোসেনের স্ত্রী ইয়াসমিন, শারমিন, নওশাদ করীম ও এহসান চৌধুরী। শারমিন ও নওশাদ করীম ছাড়া অধিকাংশ চরিত্রই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভূ। সামাজিক অচলায়তন-বন্দি, বহির্জীবনে নিষ্ক্রিয় কিন্তু অন্তর্জীবনে সক্রিয় এইসব চরিত্র বিচিত্র অসঙ্গতিতে পূর্ণ সমাজকাঠামোরই সৃষ্টি। তাদের প্রধান সমস্যা মনোদৈহিক এবং অন্তর্জগৎ অস্থির। দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিক গতিতে চলছেনা। সর্বত্র সংশয় অনিশ্চয়তা। নায়ক ইশতিয়াক হোসেন উপন্যাস লেখক। ইতোমধ্যে একটি উপন্যাস লিখেছেন। বেশ নামডাক হয়েছে। ভাগ্য তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন। খুব বেশি রগড়াতে হয়নি স্বাভাবিকভাবেই 'বিখ্যাত সাপ্তাহিকের ঈদ সংখ্যায় তার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১১০) রুচিশীল পাঠকগোষ্ঠী তাঁর লেখা পছন্দ করেছে। ইশতিয়াকের লেখা উপন্যাসের নায়িকা লোপা। ইশতিয়াকের মনোজগতে ঠাঁই করে নিয়েছে। কিছুতেই মনের

অচিনগহন থেকে নড়ছে না। লোপা নাম্নী তরুণী ইশতিয়াকের প্রাত্যহিক কাজকর্মে অদৃশ্য বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইশতিয়াক অবচেতন মনে বলে– 'লোপা তুমি আমাকে ঘুমোতে দাও লক্ষ্মীটি। অমন করে তাকিও না আমার দিকে। আমার এখন ঘুমানো দরকার, সাহিত্যিক ইশতিয়াক মিনতি জানায় তার অক্ষর প্রতিমাকে। প্রতিমা অনড়, নাছোড়। উপায়ান্তর না দেখে সরে এসে লোপা ঠিক ইশতিয়াক আর ইয়াসমিনের মাঝখানে শুয়ে পড়ে নির্দ্বিধায়। মধ্যবর্তিনী লোপার কাণ্ড দেখে ইশতিয়াক হকচকিয়ে যায়।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১১৮)

সত্যিই ইশতিয়াকের ঘুম দরকার। অস্থির প্রতিবেশে হাঁপিয়ে উঠেছে ইশতিয়াক। ইশতিয়াক আর ইয়াসমিনের চার বছরের সংসারে মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক টানাপড়েনের গ্লানি নিত্য-অনিত্য লেগেই থাকে। সীমিত আয় দিয়ে সংসার চালাতে বেগ পোহাতে হয়। দাম্পত্য স্মৃতিচারণ ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের আশায় তৃপ্তি খোঁজে এভাবে – 'ইতোমধ্যে চারটি বছর কেটে গেছে; অথচ এইতো সেদিন সে নওশা সেজে গিয়েছিলো ইয়াসমিনদের বাড়িতে। সময় বড় দ্রুত ফুরিয়ে যায়। এই জনবহুল শহরে চার বছরের পরেও ওরা নিঃসন্তান।...যাক না আরো কিছু দিন, আমাদের অবস্থা আরেকটু স্বচ্ছল হোক।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১২৫)

ইয়াসমিনের সত্তা জুড়ে মাতৃত্বের হাহাকার। ইশতিয়াকের অস্বচ্ছলতার যুক্তির পূর্ণতা পায়না ইয়াসমিনের কাছে। টানাপড়েনের সংসারে সন্তান নেওয়া বিলাসিতা মনে করে ইশতিয়াক। ইয়াসমিন নাছোড়বান্দা মা নাহলে সংসার জীবন বৃথা। শুধু অর্থের অভাবেই ইশতিয়াক ইয়াসমিনের মা হবার বাসনায় মন দেয় না। 'ইয়াসমিনের যদি নিজের সামর্থ্য থাকত তবে অনটনের সংসারে রোদের ঝিকমিক ছাড়াও তার নিজস্ব সত্তায় আনতে পারতো মুক্তির করতালি।' (তানজীম আল বায়োজীদ ২০১০ : ২৭৫) তাই লেখক ইয়াসমিনের কথনের মধ্য দিয়ে আবহমান শাশ্বত বাংলা মায়ের মাতৃত্বের হাহাকার ব্যক্ত হয়েছে – 'আমার বুঝি মা হতে ইচ্ছে করে না।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১২৫) ইশতিয়াক বাস্তববাদী, বাস্তবতার ভয়াল থাবায় ক্ষত-বিক্ষত তাঁর মধ্যবিত্ত মানসলোক। চেতনালোকে লালনও করে অনাগত সন্তানের আগমন। পিতৃত্ববোধের তাড়নায় শিহরিত হয় ইন্দ্রীয়চলন, মনোজগত হয় আন্দোলিত, ব্যস্ততা অনুভব করে অনাগত সন্তানের শিশুকালীন পরিচর্যা মুহূর্ত নিয়ে – 'ইশতিয়াক ওর চোখের সামনে দেখতে পায় কাঁথা, ছোট ছোট বালিশ, নিকার বোকার, ফীডিং বোতল, ব্রেস্ট রিলিভার, মধুর শিশি, দোলনা। ওর বিছানায় হাত-পা ছুড়ঁছে এক শিশু। ওর মুখে রবারের নিপল। হঠাৎ ভিজে ওঠে কাঁথা। শিশুটি হিসি করেছে। নবজাত শিশুটি ভীষণ চেঁচাতে শুরু করে এক সময়, বোধ হয় ক্ষুধার তাড়নায়। ইয়াসমিন নিপুণ হাতে কাঁথা গোছাতে থাকে।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১৭৭)

ইশতিয়াক হোসেন পিতৃবোধ অন্তরে লালন করেও, মিলনের পূর্বে নিয়ম করে কন্টাসেপটিক ব্যবহার করে। স্ত্রী চায় না এসব জন্মনিরোধক নিতে। হঠাৎ একদিন

ইশতিয়াকের বেমালুম ভুলে ছন্দপতন ঘটে স্বাভাবিক মিলনের। ইয়াসমিন অনুভব করে তলপেটে ব্যথা, অনিয়মিত বমিও করে। ইশতিয়াকের বুঝতে বাকি থাকলোনা যে, অবশেষে নিজের অসাবধানতায় ইয়াসমিন অনাগত সন্তানের মা হতে চলেছে। ওদের সংসারে নতুন অতিথি আসছে। এবার আরো খরচ বাড়ার পালা। ইশতিয়াক চায়নি যে, এই অতিথি আসুক। জনক হবার আনন্দকে যে আরো কিছুকাল স্থগিত রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। এ জন্যে সে নিজেকেই দায়ী করলো। সে যদি একটু সাবধান হতো তাহলে এরকম হতো না। 'ইয়াসমিন অবশ্য খুশিতে বাগবাগ। ওর চোখে, ঠোঁটে, কপালে খুশির ঝলক।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১৭৮) যে সমাজে সামগ্রিক অস্থিরতা ব্যক্তিসত্তাকে লীন ও অস্তিত্বহীন করে দিচ্ছে, সে সমাজে মধ্যবিত্তের ভাবনায় প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য চিন্তা স্থূল হওয়া অস্বাভাবিক নয় সঙ্গতিপূর্ণই বটে। ঔপন্যাসিক স্বাধীনতা পরবর্তী অস্থির সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির সত্যিকার প্রতিভূ হিসেবে ইশতিয়াককে চিহ্নিত করেছেন।

ইশতিয়াক শিল্পচর্চা করে। বড় মাপের শিল্পী। তাঁর সাহিত্য রুচিশীল পাঠকের কাছে সমাদৃত। কিন্তু শিল্পচর্চা নেহাৎ পেটের দায় মেটাতে পারে না। তাই সরকারি চাকুরি করে। বর্ধিত বেতনের আশায় বাড়তি দায়িত্বও পালন করে। সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এদেশে শুধু শিল্পচর্চা করে বেঁচে থাকা যায়না, তার আত্মকথনে ফুটে ওঠে ক্লেদসমেত ক্ষোভ 'সংসার চালাবে কী করে? এদেশে কি লিখে পেট চালানো যায়? কস্মিনকালেও নয়।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১১২) লেখকরা শিল্পোত্তীর্ণ সাহিত্য লিখেও, প্রকাশকের দৌরাত্ম্য ও উদাসীনতায় প্রকৃত লেখকস্বত্ত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। বারবার প্রকাশকের কাছে ধন্না দিয়েও পাওনা আদায় হয় না। তার বাস্তব উদাহরণ হতে পারে ইশতিয়াক। ইশতিয়াকের বয়ানের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত বঞ্চনার তিক্ত অভিজ্ঞতার চিত্র ফুটে উঠেছে– 'প্রকাশকের দহলিজে ধর্না দেবে? কোনো ফায়দা হবে বলে মনে হয় না। জনাব প্রকাশক এক গালে হেসে সাদর (অকৃত্রিম?) অভ্যর্থনা জানাবেন। এভাবে কথা বলে খামোখা লজ্জা দেবেন না ইশতিয়াক সাহেব। কিছুদিন পরে আপনার পাওনা চুকিয়ে দেবো।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১৩৯)

যেখানে লেখক প্রকাশকের সম্পর্ক, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের হওয়া কথা, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে দেখা যায় লেখকের প্রতি প্রকাশকের উদাসীনতা ও সম্মানী পরিশোধে কার্পণ্যের মনোভাব। 'লেখক তাঁর মেধা, আবেগ-অনুভূতি, শ্রম-ঘামের সমন্বয়ে যে পাণ্ডুলিপি তৈরি করে, তার উৎপাদিত বইয়ের প্রাপ্ত সম্মানী থেকে লেখককে অনেক সময়ই বঞ্চিত হতে হয়, যা প্রকাশনা সেক্টরের জন্য একটি নেতিবাচক দিক।' (খান মাহবুব ২০১২ : ৩২-৩৩) বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পে লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে রয়্যালিটির প্রাপ্রতার বিষয়টি স্বচ্ছ ও সুখকর নয়। প্রকাশনা শিল্পকে নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজাতে হলে 'আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে হয় প্রকাশনা শিল্পের অবস্থা লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক কিংবা লেখকের প্রাপ্য রয়্যালিটি নিয়ে।' (ফজলুল হক সৈকত ২০১৫ : ১২)

ইশতিয়াক সত্যিই উদ্বিগ্ন। সংসার জীবনের গ্লানি, আর্থিক টানাপড়েন, দৈহিক অবসন্নতা, এসব সমস্যা অনেকদিন ধরে আঠার মতো লেগেই আছে তার সঙ্গে। ভাগ্যলক্ষ্মীর নিষ্ঠুর আচরণে মিটাতে পারে না ব্যক্তিগত উপযোগ, রাত জেগে সাহিত্যচর্চা করার সামান্য টেবিলল্যাম্প, স্ত্রীর সামান্য আবদার। অবশ্য ইয়াসমিন ব্যক্তিগত উপযোগ স্বামীর কাছে উপস্থাপন করলেও না পাওয়ার দরুন মনে ক্ষোভ নেই। তবু মনের ভেতর উঁকি দেয় স্বপ্নের মধ্যপন্থা, যেমন টিপটপ ঝরঝরে সাদামাটা সংসার। মধ্যবিত্ত গণ্ডির ভেতরে একটি সুন্দর বাড়ি। পাশে চোখ জুড়ানো বাগান। যে বাড়িতে বসবাস করার জন্য মাসিক ভাড়া গুণতে হবে না, বাড়িওয়ালার কথা শুনতে হবে না। যা অধরায় স্বপ্নই থেকে যাবে? ঢাকার মধ্যবিত্ত কর্মজীবী শ্রেণির বাড়ি ভাড়া বাবদ চাকুরির পুরো বেতনই বাড়িওয়ালাকে দিয়ে দিতে হয়। ইশতিয়াক হোসেন স্বল্প আয়ে কোনো রকম মাথা গুঁজে ঠাঁই করে নিয়েছে ঢাকা শহরে। যা নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাপ্তির চেয়ে অপ্রাপ্তির ব্যবধানই তপ্তক্ষোভে ঝাঁঝালো আর্তনাদ তোলে। 'সাত রওজার এই গদিতে গত তিন বছর ধরে ইশতিয়াক আর ইয়াসমিন বসবাস করছে। একতলা বাড়ি। দুটি খুদে কামরা। একটা বাথরুম আর নামকাওয়াস্তে রান্নাঘর। ভালো কোনো বাসা ভাড়া নেওয়ার মতো সঙ্গতিইশতিয়াকের নেই।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১৫৭)

ইশতিয়াক হোসেন অনেকটা বিমর্ষ, বিমূর্ত, স্বাপ্নিক ও পলায়নমুখী হয়ে পড়ে এবং জীবনগ্রাসী অক্টোপাশের ছায়া দেখতে পায়। বিনাশ ঘটে মানসিক সত্তার। কল্পনায় ভেসে ওঠে পুরনো প্রেমিকা শারমিন বানুর কৈশোর প্রেমের স্মৃতি। শারমিন অবশ্য আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যে সাংসারিক দায়িত্ব পালন করছে। তাঁরা দুজনই বিবাহিত। কিন্তু প্রথম প্রেমের অতীত স্মৃতি কেউই ভুলতে পারেনি। শারমিন ইশতিয়াককে আজো ভালোবাসে; মন দিয়ে ভালোবাসে। আবার কৈশোরে শারমিন তাঁর চাচাতো ভাই আনিসকে দিয়ে যৌনতৃষ্ণাও মিটাতো। তবে আনিসকে নয় ভালোবাসতো ইশতিয়াককে। লেখক এখানে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের পারিবারিক আবহে বিকারগ্রস্ত জৈবিকতৃষ্ণা ও উত্তর-আধুনিক সমাজের পরকীয়ার আদিম কালো অন্ধকার দিকের খণ্ডচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

> আনিসের কামোৎসবে আমাকে শরীক হতে হয়েছে রাতের পর রাত। দিনে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে আমার মন, অথচ রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্র আকর্ষণ নিশি ডাকের মতো আমাকে নিয়ে যায় আনিসের ঘরে। ...মন যাকে চায়, শরীর তার দিকে ঝোঁকে না। যার শরীরের সঙ্গে শরীর মিশে যেতে চায়, তার প্রতি মন নিঃসাড় এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার জীবনে। এই দোটানায় আমি বেঁচে আছি। (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১৩০)

শারমিনের মনোদৈহিক দ্বন্দ্ব প্রবলভাবে তৃষ্ণা জাগায় অস্থির শরীরাবিষ্ট চেতনাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত সমাজের যৌন কামনালোককে। সমাজগর্হিত নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার, কামনা শাশ্বত ধ্রুবসত্য। ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ সম্পন্ন বিকারগ্রস্ত

সমাজে ব্যক্তি তাঁর ক্ষণস্থায়ী রতি-সুখ চরিতার্থ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মাঝে গণিকালয় গমন নিরতিশয় গতি পায় সংগোপনে। সময়ের বিরুপপ্রভাবে অস্থির মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিরা যৌনতায় স্বস্তির নিশানা খুঁজে নিতে চায়। আকাঙ্ক্ষার বস্তুটির প্রতি আকর্ষণ হয় দুর্বার। সমাজের কতিপয় গোষ্ঠী নিজেদের আজো গণিকালয় টিকিয়ে রেখেছে। ভোগ করে গণিকার প্রেমহীন দেহ। 'গণিকার প্রেমহীন শরীর সম্ভোগ করতে গিয়ে পাপবোধে পীড়িত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। পট পট করে গণিকার ব্লাউজের বোতাম খোলে কিংবা উদ্বেল মাছের মতো উরুস্পর্শ করে উত্তেজিত হওয়া তেমন পাপ নয়।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১৬০) অন্তত ইশতিয়াকের কাছে পাপ মনে হয়নি। তাইতো বন্ধুদের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ এলাকা বেশ্যালয়ে যায় নারীদেহের গন্ধে দেহমন টলটলায়মান হয়ে ওঠে নেশার আদপে নয় একধরনের ভয়ে। 'আমি প্রায় কাষ্টমূর্তি সেই নির্ভেজাল প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে। পা চলে না, মন অসাড়। (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১৬১) প্রত্যেক মানুষের ভেতরে মাতৃগর্ভের ন্যায় অন্ধকার কালো প্রকোষ্ঠ থাকে তা হলো অবাধ যৌনাচার। তা-যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানসে প্রবল তা কিন্তু নয়, মধ্যবিত্ত মানসকামনায়ও প্রায়শ উন্মোচিত হয়। যা ইশতিয়াকের আত্মকথনে ফুটে ওঠে। 'বন্ধুদের সঙ্গে বেশ্যালয়ে গিয়েছিলাম তাদের নাম চেপে গিয়েছি এর পেছনে কি আমার নিম্ন-মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি কাজ করছে না। (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১৬২) ইশতিয়াকের রতিবিকার আর্থিক টানাপড়েনের মধ্যে সর্বত্র খুঁজে পায় অক্টোপাসের প্রতিকৃতি। ইশতিয়াক সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের সময়কে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ৭৫-পরবর্তী সময়ের সামগ্রিক অস্থিরতা, সমাজকে করেছে দ্বিধাগ্রস্ত, জীবনকে অনিরাপদ, প্রতিকূল অস্তিত্বে লীয়মান। তাইতো ইশতিয়াক স্ত্রী-সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, জীবনবীমা করার চিন্তা, জীবন সংসারে টিকে থাকার সংগ্রাম নিরন্তর চেষ্টার নামান্তর বৈকি? সে অবচেতন মনে অবলোকন করে স্ত্রী ও অনাগত সন্তানের কথা, অর্থ সংস্থানের নিরন্তর নিরতিশয় মুসাবিদা :

> ভিড়াক্রান্ত শহরের ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ইশতিয়াক মনে মনে আবৃত্তি করে, এখন এই মুহূর্তে যত লোক রাস্তায় হাঁটছে, রিকশা, স্কুটার, বাস কিংবা মোটর করে যাচ্ছে, তারা সবাই একদিন ঘরে যাবে। সে নিজেও বাদ পড়বে না। কথাগুলো দীর্ঘশ্বাস হয়ে ঘোরে ইশতিয়াকের মনের ভেতর। সিনেমার রঙিন পোস্টার ছাপিয়ে ইয়াসমিনের প্রসাধন বিহীন মুখ ভেসে ওঠে ইশতিয়াকের চোখে। কিস্তির জোগান দিতে পারবে তো? এমনিতে সংসার চালানো মুশকিল; তার ওপর বীমার কিস্তি। (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১৩৫)

স্বপ্ন ও কল্পনার মধ্যে ডুবে গিয়ে বর্তমানকে ভুলে থাকার বা এড়িয়ে যাওয়ার নানা আয়োজন দেখা যায় ইশতিয়াকের মধ্যে। হতাশায় ডুবে গিয়েও ব্যক্তিগত জীবন-সংসারের পিছুটান থেকে মুক্তি পায় না সে। বীমা যেখানে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দাবি করে, সেই বীমার কিস্তি ইশতিয়াকের মনে সংশয় ও অস্থিরতার

কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও – 'সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে আপামর জনসাধারণকে ধাপে ধাপে বীমার আওতায় নিয়ে এসে জীবন, স্বাস্থ্য ও সম্পদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার মাধ্যমে অন্যতম মানবাধিকার হিসেবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।' (*জাতীয় বীমা নীতি-২০১৪*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১৭) ১৯৭৫-১৯৯০ কালপর্বে সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে মারাত্মক হুমকিতে পড়ে মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব। অর্জিত স্বাধীনতা, স্বপ্ন ও সম্ভাবনা থেকে জাতি নিক্ষিপ্ত হলো-দুঃস্বপ্ন ও অসহ্য যুগ-যন্ত্রণার জটিল সন্ধিক্ষণে। অস্তিত্বের মৌল শেকড়শূন্য থেকে উন্মূলিত মানুষেরা জীবিকার সন্ধানে হলো শহরমুখী – 'চোখের সামনে বয়ে চলেছে জনস্রোত, ছুটে যাচ্ছে নানা ধরনের যানবাহন। মানুষের গন্ধে বাতাস ভরপুর। ইশতিয়াক মিশে যায় জনস্রোতে। ঢাকা শহরে লোক, লোক আর লোক ইশতিয়াক তাঁর সামনের ভিড়ের দিকে চোখ রেখে ভাবে, সে নিজে এদের একজন।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১৩৪)

লেখক উল্লিখিত উক্তির দ্বারা ইশতিয়াকের অস্থির মানববোধকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং যুদ্ধোত্তর সামরিক শাসনামলে মানসিক ও আর্থিক অনিশ্চয়তায় জর্জরিত সমাজকেও। গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং ব্যক্তির বিকাশের সুবিধাবঞ্চিত সমাজ রাষ্ট্রে সংবেদনশীল মধ্যবিত্ত মানসের জন্য একমাত্র অবলম্বন হলো পলায়নপরতা ও আত্মকুণ্ডলায়ন। এ সময়কে বলা যেতে পারে সংগ্রামশীল সমাজের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আলেয়া। রক্তাক্ত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জাতি চেয়েছিল, জাতীয় জীবনে শাসকদের সুদৃষ্টিতে নিশ্চিত হবে আর্থিক জননিরাপত্তা। কিন্তু সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে করেছে হতাশায় মগ্ন ও চিন্তনে স্তব্ধ।

নিয়ত মন্তাজ

মন খাঁটি হলে মনের গহনে ডালপালা বেয়ে কল্পনার জগতে গমন করা কি অর্থহীন? তাহলে কোনো নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনে কল্পনানামক পবিত্র স্থানে গমনের আকাঙ্ক্ষা বেয়াড়া রকমের। এর কারণ কী? এই যে মানুষের মনটাই আসলে একটা ফাঁকি? নগরে ব্যস্ততা আর জীবনের ঘানি টানার জোয়াল কাঁধে মধ্যবিত্তের ভালোলাগাটুকু হয়তো কিছুটা স্বস্তি পায়। আর সে জায়গাটা হলো, মানব জীবনে জন্ম মৃত্যুর মধ্যবর্তী পর্যায়ে স্বচ্ছ চিন্তার জগত। যে জগতে বাস্তবিক আশা আকাঙ্ক্ষা প্রায়শ পূরণ হয়না, কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্রে ষোলআনা পূর্ণ।

শামসুর রাহমানের *নিয়ত মন্তাজ* উপন্যাসের নায়ক নাসিম তারেক কল্পনার ক্ষেত্রে ষোল আনা পূর্ণ করেছেন। কখনো ছায়ানটের অনুষ্ঠানে গান গেয়ে বিখ্যাত গায়কে পরিণত হয়েছে। আবার কখনো মহল্লার ফুটবল টিমে সর্বোচ্চ গোলদাতার গৌরবময় খেতাব অর্জন করেছেন। আসলে এসব বিখ্যাত ঘটনার দৃশ্য নাসিম ঘরের টেবিলে বসে হরহামেশাই সৃষ্টি করে – 'অথচ স্বরচিত চিত্রনাট্যটিতে [বরং মনোনাট্য বলা চলে]

সে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক, যার কণ্ঠ দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠস্বরকেও হার মানায়। নাসিমের বুক চিরে ঠান্ডা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। যদি সত্য হতো তার গড়ে তোলা দৃশ্যটি, তাহলে কত ভালই না হতো। সারা অডিটোরিয়ামের অভিনন্দন তখনও গুঞ্জরিত হচ্ছিল নাসিমের সত্তার প্রতিটি তন্ত্রীতে।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১৩)

নাসিম তারেক চিন্তাপ্রবণ সৃজনশীল লেখক। সাংবাদিকতায় সুনাম কুড়িয়েছে চলচ্চিত্র বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কলাম লিখে। লেখার জগতে বেশ দখল রয়েছে, মাঝে মাঝে কল্পনার খেয়া বেয়ে চলে যায় দূর দূরান্তে, দেশ হতে বিদেশ। কখনো কখনো নিজেকে দাঁড় করায় বিশ্বখ্যাত লেখকদের সারিতে। 'সে কখনো হয় গালিভার, কখনো রবিনসন ক্রুশো, কখনো বা আলেকজান্ডার, কখনো ক্যাপ্টেন কুক, কখনো নেপোলিয়ান, কখনো আলেকজান্ডার দ্যুমা, কখনো আবার সম্রাট অশোক।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১৪) স্বাধীনতা উত্তর আধুনিক নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি নাসিম তারেক। জীবন যুদ্ধে হার-না-মানা সৈনিক। মধ্যবিত্তের ইচ্ছাগুলো বাস্তবে পূরণ না হলেও পূরণ হয় কল্পনা নামক ধ্রুপদী বিশ্বে। যেখানে নিজের ইচ্ছেমাফিক সবকিছু করা এবং হওয়া সম্ভব।

নাসিম তারেক *নিয়ত মন্তাজ* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নাসিমের স্ত্রী নাহিদসহ চার বছরের কন্যা তানিকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। নাসিম পেশায় একজন সাংবাদিক। যা বেতন পায় তা দিয়ে কোনোরকম সংসার চলে। যাকে বলে একপেশে মধ্যবিত্তের সংসার। প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসাব মেলাতে পারে না সে কিছুতেই। পরিপাটি পরিবেশ চিন্তায় লালন করেও, সাধ্যে জুটে না সুন্দর পরিবেশে বসবাস। উপার্জনের মোটা অংক চলে যায় বাড়ি বাড়া দিতে। তবুও পঁচা কাঁঠালের ভূতির দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি মেলে না। নাসিমের ভাষায় – 'সে থাকে পায়রার খোপের মত একটা ঘরে, মাসিক সাতশো টাকার বিনিময়ে। কাটা ড্রেনের পাশে একটা পাকা বাড়িতে সে থাকে। বাড়ির আশে পাশে ছাই গাদা, আমের চোকলা, কাঁঠালের ভুতি, মরা ইঁদুর, বাতিল জুতো, আরো দশ রকমের আবর্জনা। একটা দুঃসহ দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে অষ্টপ্রহর। এমনও হয়, এই সব নোংরা আবর্জনা লাগাতার কয়েকদিন পড়ে থাকে স্তূপ হয়ে।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৩৮-৩৯)

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ধ্বংস স্তূপের নগরী ঢাকাতে গড়ে উঠেছে পাকা দালানকোঠা। বাড়ির মালিক হয়েছে মধ্যস্বত্বভোগীরা। অন্যদিকে নিম্ন-মধ্যবিত্তরা জীবিকার তাগিদে নগরীতে ছুটে এসে পদে পদে বঞ্চিত ও শোষিত হয়। বেশির ভাগ মানুষ বাড়িওয়ালার অনিয়ন্ত্রিত বাড়িভাড়া নামক সন্ত্রাসের শিকার হয়। নগরীর বাড়িওয়ালারা হয়ে ওঠে স্বেচ্ছাচারী। নিজেদের ইচ্ছা মাফিক বাড়ি ভাড়া বাড়ানো ও বাস্তুহারা করার করার হুমকি দেয়। বাড়িওয়ালারা সন্ত্রাসী, হৃদয়হীন ও স্বেচ্ছাচারী তাদের রাহুগ্রস্ত হস্তকরতলে ক্লিষ্ট ও নাসিম তারেকের মতো মধ্যবিত্ত জনসমাজ। নাসিমের প্রতিধ্বনিতে ধ্বনিত হয় সাধারণের দীর্ঘশ্বাসের সিম্ফনি– 'পায়রার খোপের মতো একটি ঘর, একটি রান্নাঘর আর এঁদো বাথরুম। এর জন্যেই সাতশ টাকা। মাথা

গরম হয়ে যাওয়ার যোগাড়। ও নিয়ে কিছু বলতে গেলেও বিপদ। না পোষালে বাড়ি খালি করে দ্যান, হাজার টাকা দেওয়ার জন্য লোক রেডি হয়ে আছে; বাড়িঅলার গলার আওয়াজে ঝাঁজ মিশিয়ে শুনিয়ে দেয়।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ২৫)

শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণি নয়, অন্যদিকে ঢাকার নিম্ন-শ্রেণির দিনমজুররা মধ্যস্বত্বভোগী মহাজনদের শিকার। নাসিম তারেক নিজের সাদৃশ্য খুঁজে পান এক রিকশাওয়ালার সঙ্গে। সে প্রতিদিন রিকশা চালিয়ে যা উপার্জন করে তার সিংহ ভাগ মহাজনকে দিয়ে দিতে হয়। নিজের নাভিশ্বাস আর ক্ষোভের কথা শুনালো নাসিমকে– 'কী করমু যা দিনকাল পড়ছে। এককেবারে কুফা। দিনরাইত রিকশা টানি, স্যার কুলাইবার পারি না হালায়। বেবাগ টাকা মহাজনের পেটেই হান্দায়। বিবি বাচ্চারে ঠিকমতন খাওন দিবার পারি না।'[৪১] (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৩৮) রিকশাওয়ালার পরনে ছেঁড়ালুঙ্গি, ছোট্ট ঘরে বসবাস, তার কোনো জমানো টাকা নেই, নেই কোনো প্রভিডেন্ট ফান্ড। নাসিম তারেক মুক্তির পসরা সাজায় তার নিজের জমানো টাকা নেই, নেই প্রভিডেন্ট ফান্ড। যদি কোন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সে মারা যায় তাহলে পরিবারের কী হবে? প্রকৃতপক্ষে এই আশংকা, ভাবনায় আতঙ্কগ্রস্ত উৎকণ্ঠা কেবল নাসিমের নয়। স্বপ্নভঙ্গজনিত যন্ত্রণার দাবদাহে যেখানে সমগ্র জাতিসত্তাই আক্রান্ত, সেখানে ব্যক্তিজীবনে বিকার ও রিরংসার আধিপত্য স্বাভাবিক ও সঙ্গত। যুদ্ধোত্তর সমাজে বসবাসরত নাগরিক মধ্যবিত্তের বিরাট অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। উদীয়মান অর্থনীতিতে দোদুল্যমান সমাজের চিন্তা ভাবনায় পরিলক্ষিত হয়, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের আশংকা ও মৃত্যুচিন্তা। সামাজিক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব। নিমজ্জমান জলযানের মতো জীবনতরী ভাসিয়ে চলছে সমাজের বড় একটা অংশ। যার প্রতিনিধিত্বশীল ডেমো চরিত্র নাসিম।

নাসিম আর নাহিদ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয় চার বছর আগে। টানাপড়েনের সংসার টেনেটুনে চলছে। বিয়ের এক বছরের মধ্যে এলো প্রথম সন্তান তানি। সংসারে খরচ একধাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু আনন্দের রেশটুকু বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নাসিম সারাদিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গ্লানি জানান দেয় চোখে মুখে। কিন্তু কোমলমতি চার বছরের শিশু তানিকে দেখার পর মুছে যায় সব গ্লানি। সন্তানবাৎসল্য দায়িত্বশীল পিতা নাসিম। এই তানিকে নিয়েই নাসিমের কল্পরাজ্য সরগরম। মরুময় বালুতে মরূদ্যান সৃষ্টি করে সে। নাসিম ভাবে – 'এই তিন বছরের ছোট্ট তানি, একদিন বড় হবে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে, তারপর একদিন বিয়ে হবে ওর, সন্তান-সন্ততি হবে। সবকিছু বদলে যাবে তখন। তানির বিয়ের কথা ভাবতেই নাসিমের মন খারাপ হয়ে যায়।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৪০)

নাসিমের ভাবনার মাঝে কোনো ক্লেদ নেই। আবহমান বাংলার পারিবারিক রীতিনীতি থেকে নাসিমও ব্যতিক্রম নয়। নাসিমের কল্পনা জুড়ে বিরাজমান সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা। নাসিম পারিবারিক বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করতে চায়। একই সময়ে বিপরীত মেরুকরণ লক্ষ করা যায়, যখন নাসিমের বন্ধু কবি শফিক আহমদ স্ত্রী সন্তান

রেখে দ্বিতীয় বিবাহ করে। লেখক দেখাতে চেয়েছেন সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের দাম্পত্য সংকট ও নারী পুরুষের বহুগামিতার বহুভুজ সংকটের শুঁড়বন্দি প্রতিচ্ছবি। একই সমাজে বিচিত্রমুখি চরিত্র, নদীর বাঁকের মত ব্যক্তিজীবনেও বাঁক বদল ঘটে। জীবনতরী বয়ে চলে বাস্তবতার অনুকূলে এবং প্রতিকূলে। কবি শফিক আহমদের দ্বিতীয় বিয়েকে নাসিম নীতিগতভাবে অনুসমর্থন করে। কারণ শফিকের মতো নাসিমও জীবনস্রোতের প্রতিকূলে প্রবাহিত হতে চায়। নাসিমের অবচেতন মনে ধ্বনিত হয় – 'কবি শফিক আহমদকে আমি কেন সাপোর্ট করছি? ওদের প্রেমের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল বলেই কি? না আমিও শফিক আহমদের মতো এমন একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে চায়। আমার মনের ভেতর এমন একটা ইচ্ছা ঘাপটি মেরে আছে? বুজরুকি ছাড় নাসিম, স্বীকার করে ফেল। নিজের কাছে কবুল করতে লজ্জা কিসের?।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৪৪)

নাসিম তারেকের অর্ন্তজগৎ ও বর্হিজগৎ আন্দোলিত হচ্ছে। তাঁর ভাবনার মাঝে নতুন সূচের তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হচ্ছে। নাসিম কি কাউকে ভালবাসে? হ্যাঁ নাসিম চলচ্চিত্র অভিনেত্রী নমিতাকে ভালবাসে। তার কথা ভাবতেই নির্জনতা নেমে আসে মনে। ভীষণ একা লাগে, যেন তাঁর আলোকিত ভুবনে সন্ধ্যার তিমির উঁকি দিয়ে যায়। যেন উত্তর-আধুনিক জীবন ভাবনার বাস্তব প্রভাব ছুঁতে শুরু করেছে আশির দশকের মধ্যবিত্তের জীবনে। ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ সমষ্টি বিচ্ছিন্ন জীবনবোধের রূপায়ণ ঘটতে শুরু করেছে। পলায়নমুখী বহুগামিতা আষ্টেপৃষ্টে শৃঙ্খলিত করেছে সামাজিক রুচিশীলতাকে।

নাসিম তারেকের মনোজগতে ক্রিয়াশীল থাকে সৃজিত প্রেমিকের প্রেমবোধ। নাসিম নমিতাকে ভালবাসে কিন্তু তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। সে নমিতার অস্তিত্বের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পায় নাহিদের চেহারায়। যাকে বলে সুপার ইম্পোজিশন। নাসিমের অস্তিত্বে নমিতার ছায়ারূপী প্রতিকৃতি সমকালীন অস্থিরতার নামান্তর। লেখক সমকালের যুগ-যন্ত্রণার অস্তিরতাকে বুঝাতে ব্যক্তিমানসের উপর ছায়াময়ী নিঃসঙ্গতার প্রচণ্ড অনুররণ সৃষ্টি করেছেন বলে মনে করা যায়। মধ্যবিত্ত নাগরিকদের মনে যুদ্ধোত্তর সমাজের অস্থিরতার ছাপ নিদারুণভাবে লেপে দিয়েছে। চারদিকে হতাশা, চাকরি, ব্যবসা, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিরাজমান অনিশ্চয়তা কড়া নেড়ে যায় সচেতন নাগরিকদের।

যুদ্ধপরবর্তী সমাজে বসবাসরত মানুষদের প্রাত্যহিক গ্লানি এবং গ্লানি মোচনের নিয়ামক হিসেবে পাশ্চাত্য জীবনাচরণ ও রতিবিকারের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। আমরা উপন্যাসের নায়িকা নমিতার চিঠির ফ্লাশব্যাক থেকে জানা যায়, নমিতা চিত্রাভিনেত্রী। ক্যামেরার সামনেই প্রিয়-অপ্রিয় অন্যের কথা আওড়াতে দেখা যায়। রূপালি জগতের জীবন ও জগতের বাইরের জীবনের তাৎপর্য গোছাতে পারেনি আজো। খোঁজ পায় না

স্বয়ং অস্তিত্বের। নমিতার দ্বিধান্বিতচিত্তে ধ্বনিত হয়– 'এই আমি আসল আমি নয়। এই আমি আমার কেউ নয়। অর্থাৎ আমার আমিকে আজো খুঁজে পাইনি।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৫০) এখানে লেখক নমিতাকে উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি করে তুলেছেন। নমিতার জীবন রূপালি জগতের আড়ালে বাস্তবতা বিবর্জিত নয়। ফিল্ম জগতে কাজ করতে এসে নানান তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। নমিতার তিক্ত অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে রূপালি জগতে টিকে থাকার প্রাক-যোগ্যতার মাপকাঠি দেহে যৌবনের ডাগরতা ও সিনেমা কারিগরদের মনোরঞ্জন। শরীরে যতদিন যৌবনের জোয়ার থাকে, ততদিন দর্শকের মনোজ আকর্ষণে সক্রিয়তা বজায় থাকে। নমিতার আত্মকথনে শঙ্কার চিত্র ফুটে ওঠে – 'অস্বীকার করছি না, শরীর আমাদের অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। যতদিন এই শরীরে যৌবনের ডাগরতা আছে, মাদকতা আছে, চেহারার সৌন্দর্য আছে ততদিন আমাদের বাজারদর চড়া। আর আমাদের এই শরীরটাকে চাটার জন্য, চটকানোর জন্যে পুরুষদের হ্যাংলামির কোনো সীমা পরিসীমা নেই।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৫১)

নমিতার কাছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির রকমফের ধরা পড়েছে। রূপালি জগতে যারা কাজ করে তাঁরাও পর্দার অন্তরালে স্রেফ একজন মানুষ। নমিতা মনে করে তারও অস্তিত্ব রয়েছে, রয়েছে ব্যক্তি পরিচয়, কিন্তু সমাজ এবং সমাজের মানুষদের কাছে ব্যক্তি নমিতাকে ছাপিয়ে পণ্য নমিতা হিসেবে বেশি পরিচিতি পেয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উপনিবেশবাদ কোনো স্থির বিমূঢ় নকশায় ফেলার বিষয় নয়। সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে তার বিষদাঁত। আর নারীরা শিকার একধরনের দ্বৈত উপনিবেশবাদের দ্বারা। সে মনে করে সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিকে পণ্যে রূপান্তরে ব্যতিব্যস্ত, যা সমাজের পচনশীল, রুগ্ন, বৈষম্যমূলক ও আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার বহির্প্রকাশ। 'ওরা মানে পুরুষরা আমার দিকে এভাবে তাকায় যেন আমি একটা পণ্য। সুন্দর ঝলমলে পণ্য।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৫১) নমিতা এও মনে করে যে, ফিল্ম জগত মানে প্রতিষ্ঠা, বিলাসিতা, পাশ্চাত্য জীবনধারা এবং অল্পদিনে নামজাদা শিল্পীদের একজন হয়ে ওঠা। নমিতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বটে, কিন্তু সে কি বাস্তবিক অর্থে সুখী? এই বাস্তবতার মূল্যায়ন নিজেই নিজেকে দিয়ে করে– 'আমি কি বাস্তবিকই সুখী? আমার অনেক টাকা আছে, গুলশানে মস্তবড় বাড়ি আছে, গাড়ি আছে লেটেস্ট মডেলের, আমি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন তারকা ফিল্ম মাস্টার। বেশুমার আমার ভক্ত। আমার সুখের কমতি কোথায়?' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৫১)

প্রকৃতপক্ষে কি নমিতা সুখী। না নমিতার বাহ্যিক পৃথিবী অর্থের প্রভাবে আলোকিত। কিন্তু অন্তর্জগতে নমিতা সুখী নয়। শরীর ও মনের দ্বন্দ্ব আজো মিটাতে পারে না। নাসিমকে ভালোবাসে নমিতা। কিন্তু নমিতা লুকিয়ে রাখতে চায় আর্দ্র আবেগকে; সে ঠিক ভরসা খুঁজে পায় না নাসিমের সত্তার কাছে। কিন্তু নাসিমের দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যময় সংসারে নমিতা জীবনের তীর্থ খুঁটি গাড়তে চায় না বলে একজন ব্যবসায়িকে বিয়ে

করার সিদ্ধান্ত নেয়। 'আমি শেষ পর্যন্ত দেখেশুনে একজন শাঁসালো বিজনেসম্যানকেই বিয়ে করব।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৫১) নমিতার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি মিটাতে পেরেছে, কিন্তু নাসিমকে বিয়ে না করলেও নমিতা আজোও নাসিমের হৃদয়ের প্রতি অনুপম দুর্বল। স্ত্রী, সন্তান থাকার পরও নাসিম মনে মনে আজোও ভালবাসে নমিতাকে। তবে দুজনার বাস্তবিক গন্তব্য দুই মেরুতে – 'নাসিম তারেক যখন বেচারাম দেউড়ির গলিতে খাটা ড্রেন, আমের চোকলা, কাঁঠালের ভুতি আর মরা ইঁদুরের উৎকৃষ্ট দুগন্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে দরজার কড়া নাড়াছিল, নমিতা তখন এফ.ডি.সি'র স্টুডিও ফ্লোরে আর্কল্যাম্পের আলোয়, ক্যামেরার সামনে নায়ক আবিদের বাহুলগ্না হয়ে ভালবাসার ডায়লগ বলছে আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠস্বরে।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৫৮) দুজনের জীবনভাবনা নদীর দুকূলের মতো। উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবন যাপনে বাস্তবতা ও কল্পনার ব্যবধান বহুমাত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

অদ্ভুত আঁধার এক

অদ্ভুত আঁধার এক ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। উপন্যাসটিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে একটি পরিবারের বিড়ম্বনা, আতঙ্ক ও দুর্দশার অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। যুদ্ধের মর্মান্তিকতা শহর থেকে শুরু করে প্রান্তিক গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের রাজধানী ও প্রাণ কেন্দ্র ঢাকা। ঢাকাকে আক্রমণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালনা করে নির্বিচারে হত্যা করে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিদের। ঢাকা শহর পরিণত হয় মৃত্যু নগরীতে। চারদিকে বারুদ পোড়া গন্ধ আর আগুনের লেলিহান স্ফুলিঙ্গ। ২৬-এ মার্চ ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ২৭-এ মার্চ তৎকালীন মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন –

> হঠাৎ রেডিওতে মেজর জিয়ার ঘোষণা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের নামে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। কে এই মেজর জিয়া? যিনিই হোক, তিনি বাঙালিদের আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন।...৭ই মার্চেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, যখন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই ধ্বনি আশ্রয় পেয়েছিল এদেশের আকাশে বাতাসে, বাংলাদেশের হৃদয়ে। (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৬৬)

যুদ্ধ চলাকালে লেখক, বুদ্ধিজীবী-পেশাজীবী ও নাগরিক মধ্যবিত্ত শেণির মধ্যে বিরাজ করে চরম আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা। নিরাপত্তার সন্ধানে বহুসংখ্যক মানুষ শহর থেকে গ্রামে এবং কিছুসংখ্যক মানুষ গ্রাম থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে আশ্রয় নেয় ভারতে। তেমনি নাদিম ইউসুফের পরিবারও আতঙ্কের রাহুগ্রাস হতে মুক্ত হতে পারেনি। নাদিম ইউসুফ পেশায় একজন সাংবাদিক। টানাপড়েনের সংসার, যাকে বলে মধ্যবিত্তের

পরিবার। পরিবার পরিজনদের নিয়ে ঢাকায় বসবাস করে। কিন্তু ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে পরিবারটি। সিদ্ধান্ত নেয় নিরাপদ আশ্রয় গ্রামের বাড়ি চলে যাওয়ার। 'ঢাকা শহর থেকে সে পালিয়ে এসেছে বন্ধু-বান্ধবকে ছেড়ে, অনেক আত্মীয় স্বজনকে পেছনে ফেলে রেখে।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৬৬-৬৭) পলাশতলীতে পাক সেনাদের আক্রমণ নেই বললেই চলে, গ্রামের সাধারণ মানুষ ঢাকা শহরের যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে নাদিমের কাছে জানতে চায় – " 'ডাহার খবর কি বাই', একজন প্রশ্ন করেন। পুবের হাটির কে যেন। নাম ভুলে গেছে নাদিম। কী খবর দেবে সে? ওর গলা থেকে কোনো আওয়াজ বেরোতে চায় না। সে কোনো মতে বলল, 'পাকিস্তানী সৈন্যরা জ্বালায়া পোড়ায়া মানুষ মাইরা এক শা করতাছে।' এটুকু বলেই নাদিম চুপচাপ।" (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৬৬) নাদিমের মন শঙ্কামুক্ত নয়। আতঙ্কে শিহরিত হয়ে ওঠে তাঁর মন। যুদ্ধে ঘটে যাওয়া দৃশ্যপট কিছুতেই ভুলতে পারছে না নাদিম। বার বার স্মৃতির ফ্ল্যাশব্যাকে ভেসে ওঠা করুণ দৃশ্য তাঁর কাছে হৃদয় বিদারক মনে হচ্ছে। যেন কিছুতেই স্বস্তি মিলছে না। মনে পড়ে প্রিয় শিক্ষক কর্মস্থলের সহকর্মীদের কথা – 'ঢাকার কথা ভুলে থাকতে চায় সে। কিন্তু যতই ভুলে থাকতে চায়, ততই মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে রাজীব আহসানের কথা। শোয়েব চৌধুরী, নঈম আহমদ, জামিল আখতার এক সঙ্গে কতগুলো মুখ।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৭০) নাদিম এখন নিঃসঙ্গ। নিজের অস্তিত্বটাকে অস্বস্তির স্তূপ মনে হয় নিজের কাছে। নাদিমের মনে হাজারো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। দেশ মাতৃকার টানে অনেকে পাড়ি জমাচ্ছে ওপার বাংলায়। যেখানে 'ভারতীয় প্রজাতন্ত্র লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আশ্রয় দিল, প্রদান করল বস্তুগত সহায়তা, মুক্তিযুদ্ধে নৈতিক সমর্থন দিল এবং সংগ্রহ করে দিল আন্তর্জাতিক আনুকূল্য।' (বদিউজ্জামান খান ১৯৯৭ : ২১৬) যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য। নাদিমের চল্লিশোর্ধ বয়স। সে এই বয়সে যুদ্ধ করার জন্য কতটা প্রস্তুত? সে এও জানে 'বন্দুক ধরতে না পারলে দেশ মাতৃভূমিকে রাহু মুক্ত করা যাবেনা' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৯৪) নাদিম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, যুদ্ধে যাবে কি না। আবার পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতাও কাজ করছে। পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত স্ত্রী-সন্তান-মা-বোনদের একা রেখে কীভাবে যাবে সে। 'নেকড়েদের ভিড়ে এদের রেখে চলে যাব একা? এই প্রশ্ন নাদিমকে বিচলিত করে।'(শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৯৪) চাকরির উপার্জনের মাধ্যমে নাদিমের সংসার চলে। এখন সে চাকরির বাইরে। টাকা যা ছিল সব ফুরিয়ে আসছে তাই টাকা পয়সা খরচের বিষয়েও নিজে সতর্ক। 'মানিব্যাগের প্রতি সতর্ক নজর রাখতে হবে। এখন একটি পয়সাও মূল্যবান।... নাদিম ভাবে টাকা ফুরিয়ে আসবে ক্রমান্বয়ে। তখন টাকা পাব কোথায়?' (মো: মোস্তাফিজুর রহমান ২০০৯ : ১০) এখানে নাদিমকে মধ্যবিত্তের প্রতিভূ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। মধ্যবিত্তের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, টানাপড়েন ও মানসিক অস্থিরতার বাস্তব চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা দোদুল্যমান, কখনো তারা প্রগতিশীল কখনো আবার প্রতিক্রিয়াশীল।

নাদিমের কাছে নিজেকে জীবন্মৃত মনে হচ্ছে। সে বাস্তবতার কঠিন মুহূর্তে উপনীত হয়েছে। নাদিমের মনে নস্টালজিয়া কাজ করে। এই সংকটময় মুহূর্তে 'মরা জ্যোৎস্নায় গোরস্তানকে অত্যন্ত রহস্যময় মনে হচ্ছে।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৯৪) তাঁর পিতা মরহুম তমিজ উদ্দিন চৌধুরীকে মরা জ্যোৎস্নার মতো মনে হচ্ছে। সে এখন মৃত। তাঁর জগৎ-সংসারের প্রতি কোনো দায় নেই। নেই কোনো 'টাকা না-থাকার ভাবনা, বাড়ি বানানো না বানানোর চিন্তা, চাকরিতে গ্রেড থেকে গ্রেডান্তরে পৌঁছানোর রেস, ব্যবসায়ে তেজী মন্দা, ছেলে-মেয়ের ঝক্কি-ঝামেলা, বিয়ে-শাদী, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা-দ্বিধাদ্বন্দ্ব'। (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৮৬) কিন্তু নাদিমের চিন্তা, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সব কিছু আছে। নাদিমকে আজকের দিনে এসব নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। তাঁর মনোজগৎ আজ ক্ষত-বিক্ষত, চূর্ণ-বিচূর্ণ।

চরম বাস্তবতার দ্বারপ্রান্তে এসে নাদিমের স্মৃতিতে উদিত হয় কৈশোর ও যৌবনের কথা। মনে পড়ে সামিনার কথা। যার সাথে প্রথম মনের ভাব বিনিময় হয়, সেই সাথে প্রেম ও প্রথম প্রণয়লীলা। যে কিনা যৌবনে সব উজাড় করে দিয়েছিল নাদিমকে। 'সে তার শরীরে স্বেচ্ছায় শোষণ করে নিত নাদিমের যৌবনটা।'[৬৫] (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৮৫) কিন্তু নাদিম সামিনাকে মনে-প্রাণে ভালবাসেনি। সে ভালবেসেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শাকিলাকে। শাকিলাকে গভীরভাবে ভালবেসেছিল নাদিম। 'সে ভালবাসায় প্রচুর উচ্ছলতা ছিল, কিন্তু কোনো খাদ ছিলনা। নাদিম তার দিনগুলি রাতগুলি উৎসর্গ করেছিল ওর দয়িতার প্রতি।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৮৫) শাকিলা ছিল চরম বাস্তববাদী। 'সেই শাকিলা যে খুব প্র্যাকটিক্যাল, যে বড় নির্ভাজ প্র্যাগমেটিক। বাস্তবের দয়িতা সে, তোমার না।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৮৭) ছন্নছাড়া বেকার নাদিমকে ভুলে বিয়ে করে নেয় অন্য আরেকজনকে। নাদিম এই কষ্ট-যন্ত্রণায় এম.এ পরীক্ষাটি পর্যন্ত মিস করে। নাদিম চরমভাবে ভেঙে পড়ে। হতাশা, নিঃসঙ্গতায় নিজেকে হনন করার প্রাণান্তকর চেষ্টা পর্যন্ত করে। 'মৃত্যু ওকে সুদর্শনা গণিকার মত চটুল আমন্ত্রণ জানাত বারবার।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ৮৬-৮৭) কিন্তু নাদিম এই বিমিশ্র সত্তা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পায় অচিরেই। শাকিলা যে তার জীবনের সব কিছু না, সে ঠিক বুঝতে পারে। একদিন নাদিম নিজেকে নিজেই শোনায় – 'আমাকে বেঁচে থাকতে হবে, আত্মহননে আমার মুক্তি নেই, একদিন নিজেকে দৃঢ় কণ্ঠে শোনাল নাদিম। আমার স্বপ্ন আছে, সাধ আছে, কবিতার প্রতি ভালবাসা আছে, এসবের মধ্যে খুঁজতে হবে বাঁচার সার্থকতা।'(শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১০১)

মরার মাঝে কোনো সার্থকতা নেই। মানুষের স্বপ্ন ভাঙে, আবার তাঁরা স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নের জাল বুনে যায় যতদিন শ্বাস থাকে। নদী যেমন একূল ভেঙে, অন্য কূল গড়ে। নাদিমেরও তাই ঘটল। সে নাজমা নামের দূরাত্মীয়ার প্রেমে পড়ে এবং তাকে জীবন সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়। দুই সন্তানের জনক হওয়ার পরও নাদিম বেকার। বাবার

আয়ের উপর নির্ভরশীল। একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারে যা দেখা যায়, পরিবারের প্রধানই সংসারের খরচ নির্বাহ করে। বাংলাদেশের বিকাশমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তজীবনের বহুমাত্রিক জটিলতার প্রতীক নাদিম। শিক্ষিত বেকার নাদিমের কাছে পরিবারের গলগ্রহ হয়ে থাকাটা মোটেও আত্ম-সম্মানবোধ মনে হয়নি। নববধূর এমন কিছু আর্থিক চাহিদা রয়েছে যা পূরণ করাটাও নাদিমের পক্ষে কষ্টকর হচ্ছে – 'স্মিতা যখন এলো ওদের সংসারে, তখনো কোনো নিয়োগপত্র আসেনি নাদিমের হাতে।...এমন কিছু খুঁটিনাটি আছে যেমন ব্রেসিয়ার, জাঙ্গিয়া, সপটেক্স ইত্যাদি-যার জন্যে আব্বার কাছে হাত পাতা যায় না ঘন ঘন। একটা চাকরি জোটাতে হবে।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১০২)

নাদিমের মধ্য দিয়ে সমকালীন তারুণ্যের অপরিমেয় সম্ভাবনার অপচয়কেই নির্দেশ করেছেন ঔপন্যাসিক। যে অবলম্বন খুঁজে পায় সংশয়, উদ্বেগ, অস্থিরতা এবং আত্মবিশ্বাসহীনতায় তা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় এক অনিশ্চিত, অকূল তমসাগহ্বরে। নাদিম কঠিন বাস্তবতাকে জয় করতে চায়। চাকুরিহীনতার অভিশাপ হতে নিজেকে মুক্ত করতে চায়। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় – 'আই নিড এ জব, আই নিড এ জব ভেরি ব্যাডলি।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১০২) পথে নামলেই পথই পথ দেখায়। কর্ম লাভের দমিত বাসনা নিরাশ করেনি নাদিমকে। দ্য সেন্টিনালে নাদিমের চাকরি হলো। জুনিয়র সাব-এডিটর। দেড়শ টাকা মাইনে। যুদ্ধকালে চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হয় মফস্বলে। যুদ্ধকালীন নাগরিক মধ্যবিত্তের অস্বিত্ব সংকটের মধ্যে পড়ে। আশা নিরাশার সংশয় ও ব্যক্তির আত্মব্যাখ্যা ও আত্ম-উন্মোচনের তীব্র আকার ধরা পড়ে। নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসের আত্মভুক, উপযোগ, জীবনের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা ও মীমাংসাহীনতার যন্ত্রণার অতীষ্ঠতা লক্ষণীয় হয় স্পষ্টভাবে। 'তবে জীবদ্দশায় গ্রাম নয়, শহরের মদির নেশায় তার সম্বল। এই নেশাই জীবন, যেখানে পরিমাণ মতো সংগ্রামে ছুটতে হবে বহু দূরের পথে। আর নেশা ছুটে গেলে মৃত্যুপারে তার নীরিহ মালা।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১১০) শেষ পর্যন্ত নিজের অনিচ্ছায় ঢাকার কর্মস্থলে ফিরতে হলো নাদিমকে। শুধু বাঁচার তাগিদে যোগদান করতে হবে চাকুরিতে। 'এই তো ওকে নিজের ইচ্ছার বিরোদ্ধে যেতে হচ্ছে ঢাকায়। সংসার চালাতে হলে চাকুরি তাকে করতেই হবে। বাঁচোয়া নেই।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১১০) আজ নিজেকে মনে হচ্ছে মৃত্তিকাবিচ্ছিন্ন উন্মুলিত সত্তা। চারদিকে অন্ধকার অমানিশা। নিরাশ্রয়ী নাদিম তাঁর মধ্যে খুঁজতে শুরু করেছে একটু আশ্রয়। তিলোত্তমা নগরীর বিধ্বস্ত রূপ দেখে নাদিমের অভ্যন্তরে ঘটে আলোড়ন ও ক্ষত বিক্ষত চিত্ত রক্তে রঞ্জিত হয় – 'ঢাকা শহরে পা রেখেই নাদিমের মনে হল সে যেন এক বেগানা শহরে এসে পরেছে। প্রায় সব কিছু চেনা মনে হচ্ছে না। তারাবো, ডেমরা, যাত্রাবাড়ি, বাসস্ট্যান্ড, স্কুটার, দোকানপাট, গাছপালা সব কিছুই যেন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। ...ঢাকা শহরের হৃদয় থেকে ঝরছে এক বিরতিহীন নিঃশব্দ মাতম।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১১২-১১৩)

নাদিম এখন বিচ্ছিন্নতার দ্বিতীয় মাত্রায় উপনীত। যুদ্ধরত মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনকেন্দ্রে তাঁর অবস্থান, তা ছিল বৃহত্তর দেশের অস্তিত্বধারার সঙ্গে অসমন্বয়, সাংঘর্ষিক ও যন্ত্রণাদীর্ণ। একদিকে আর্থিক অভাব অনটন ও অন্যদিকে নীতিবোধের নৈতিক তাড়নায় বিদীর্ণ, চূর্ণ-বিচূর্ণ। পাকিস্তান সরকার নিয়ন্ত্রিত দৈনিক পত্রিকা অফিসে কাজে যোগদান করা না করার দ্বন্দ্বে বিমিশ্র ভাব। ঔপন্যাসিক স্বাধীনতা উত্তর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের টানাপড়েন ও অস্থির মানসের স্বরূপ উন্মোচনর করেছেন নাদিম ইউসুফের আত্ম-কথনের মাধ্যমে – 'রাজীব আহসানের মত আরো কেউ কেউ করেনি। আমিও করব না, নাদিম মনস্থির করল। এই দাসত্ব আর করা যাবেনা ঢের হয়েছে। ...হঠাৎ কি মনে হলো নাদিমের সে প্রায় নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, 'আমি কাজে জয়েন করতে চাই।' ওর মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে গেল বাক্যটি। নিজের কানকেই নাদিম বিশ্বাস করতে পারল না। এই বাক্য উচ্চারণ করার কথা ছিল না।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১১৪)

নাদিম আজ পরাজিত। নিজ আত্মার কাছে পরাজিত হয়েছে বলা সমীচীন হবেনা, মধ্যবিত্তের নিরন্তর জীবনবীক্ষার স্থূল প্রাত্যহিক উপযোগের পরাজয় হয়েছে। রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতিক বাস্তবতার বিবর্ণ রূপ চিত্রিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি যুবক নাদিমের অনন্বিত মানসসত্তা আজ কেন্দ্রচ্যুত। নাদিমের কাছে আজ সব কিছু অস্পষ্ট, নির্লিপ্ত জীর্ণ-শীর্ণ মনে হচ্ছে। ঢাকা শহর আজ অদ্ভুত আঁধারে ঢাকা। বেদনায় পীড়িত নগর আর আত্মা দুটোই নৈঃসঙ্গ্যে অবলীন – নিজের কাছে নিজেকেই আজ নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছে নাদিমের। দেশ স্বাধীন হবে, কিন্তু সেই স্বাধীনতায় তাঁর কোনো অংশ থাকবে না। লজ্জা একটা বিষাক্ত ফুলের মত গেঁথে থাকবে ওর মনের ভেতর। দুনিয়া বদলে যাবে, এই পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা থাকবে না ওর। নাদিম হাঁটছে কোনো মৃত আত্মার মত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে আতঙ্ক, হতাশা, নৈঃসঙ্গ্যবোধ, অন্তর্দাহ ও অসহায়ত্ব নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসবোধের আভ্যন্তরকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। বাস্তবতা বিবর্জিত আবহ শহুরে নাগরিকদের করেছে পলায়নমুখী ও আত্মসন্ধানী। 'শামসুর রাহমান নাগরিক জীবনযাপন, বৈদগ্ধ্য, ফাঁপা মানুষের চালচিত্র, ফন্দি-ফিকির, ধান্দা, মেরুদণ্ড বাঁকা করেও বেঁচে থাকার চেষ্টা পর্যবেক্ষণ করেছেন, সবকিছুর কাছ থেকে দেখার ও বুঝার চেষ্টা করেছেন।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ১০৯) উপন্যাসের নায়ক নাদিম ইউসুফ বস্তুময় জগতে মনোহীন ও অভ্যাসবদ্ধ নিরর্থক গার্হস্থ্যভিত্তিক জীবন কাঠামোর বৃত্ত ভাঙতে পারেনি। স্থূল প্রাত্যহিক জীবনের দায়বদ্ধতা রক্ষা করতে গিয়ে যোগ দিতে হয়েছে পাকিস্তান সরকার নিয়ন্ত্রিত দৈনিক পত্রিকা অফিসে। ঔপন্যাসিক যুদ্ধের ভয়াবহতায় শহুরে নাগরিকদের আত্মসন্ধান ও মুক্তির প্রয়াসকে মানবিকতা ও নৈর্ব্যক্তিক দ্বৈত শিল্পময়তায় পরিবেশন করেছেন। খাতার পাতায় সদ্য লেখা দুটি কবিতা। নাদিম সেই খাতা স্পর্শ করল আলগোছে, যেন দয়িতার শরীর ছুঁল। যেন সে স্পর্শ করল স্বাধীনতাকে। এই বিধ্বস্ত জীবনভূমিতে বসেও শামসুর রাহমানের নায়ক

স্বাধীনতার সম্ভাবনায় আস্থাশীল। এ উপন্যাস শুধু একাত্তরের বাংলাদেশের হাহাকারের চিত্র নয়, তাঁর দীপ্ত যৌবনেরও এ এক প্রতিচ্ছবি।

এলো সে অবেলায়

হিরো নিজেই নিজের কাহিনি লিখছে। তাঁর দুঃখ আনন্দ প্রেম শরীরের কথা লিখছে। গল্পের হিরো নিজেই কমিনিকেট করছে তাঁর পাঠকের সঙ্গে। কিন্তু রগরগে ব্যাপারটা ছিল না। একটা শৈল্পিক ব্যাপার ছিল এবং অধিকাংশ প্রেমের গল্পের মতো এখানে শেষ দৃশ্যে নায়ক নায়িকার মিলন ছিল না। ছিল বিচ্ছেদ ও বিরহ। নায়কের ভিতরে যে আরো একটা মানুষ আছে তার মনে এই ইচ্ছে হয়তো আছে যেন ইচ্ছেগুলো শব্দ হয়ে বেরিয়ে এসেছে। শৈশব–কৈশোর অতিক্রম করে তার বড় হয়ে ওঠা, পরিণত মানুষ হয়ে ওঠা, জামিলের জীবনে পূর্ণতা অপূর্ণতার দোলাচল, অকৃতার্থ প্রেমের অভিঘাত এমন গভীর মমতায় তুলে ধরা হয়েছে, যা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে তো বটেই কাহিনিতে এনে দিয়েছে এক পরিতৃপ্ত মানবিকতা।

জামিল আখতার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সে খুব একা এবং অসুখী। নানা অসংগতি অসুস্থতার মাঝে তাঁর বসবাস। 'কফির চামচের রোমান্টিকতায় জীবন বিসর্জন দিয়ে জামিল আখতারের তাই একলা সাম্রাজ্য পাহারা দিতেও দ্বিধা নেই। মৃত্যুর মাঝে যে মানবিক স্বাদ তা থেকেও তার পলায়নপরতা অব্যাহত থাকে।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ২০৬-২০৭) সে জর্জরিত তাঁর অন্তর্চারী বেদনাবোধে। জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানো সেতো এক রকম আত্মিক মৃত্যু। অবসাদে অন্ধকারে ডুবে থাকা সেও এক প্রকার মৃত্যু। জামিলের মন পীড়িত হয় মৃত্যুভাবনায়। মৃত্যুর কাছে সে কি এক সময় বাগদত্তা হয়ে যায়? মুত্যু আছে বলেই সে আসে। তবে আলিঙ্গনে দ্বিধা কেন? সে কি সব মুছে দেয় বলে? তাই আত্মসমর্পণে এত অনীহা? তাই কি বার বার মৃত্যু নয়, জীবনের হাত ধরে জামিল প্রবেশ করতে চান না জীবনের গহ্বরে –

> জামিল আখতারের বুক চিরে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরোয়। সঙ্গে সঙ্গে ওর মৃত্যু চিন্তা এলো বাজ পাখির মতো ডানা ঝাপটিয়ে। এই মুহূর্তে যদি আমি মরে যাই, জামিল ভাবেন।... অস্থির হয়ে ওঠে জামিল। কী সংক্ষিপ্ত মানুষের জীবন! একটা মানুষ ষাট-সত্তর বছর বাঁচে, অনেকে তারও কম, কেউ কেউ একটু বেশি পৃথিবীর রৌদ্র-জ্যোৎস্নায়, হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেয়, তারপর সব শেষ। মৃত্যুর পর আর কোনো জাগরণ নেই, কোনো অনুভূতি নেই। এক সীমাহীন নাস্তিতে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া কিছু নেই। হাজার হাজার বছর আগে অগণিত মানুষ এই পৃথিবীর চালচুলো নিয়ে সংসার করেছে, সন্তান উৎপাদন করেছে, মরে গেছে। তাদের কথা কেউ মনে রাখেনা। মনে রাখেনি। আমার মৃত্যুও অনিবার্য, দেয়ালে মাথা কুটে মরলেও সেই ভয়ংকরকে রোধ করা যাবেনা, জামিল আখতার মনে মনে উচ্চারণ করে। (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ২০৬)

জামিল এই মুহূর্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চায় না। সে বাঁচতে চায়। প্রৌঢ়ত্বের সায়াহ্নে এসে উপলব্ধি ঘটে যৌবনকে ফিরে পাওয়ার। তারুণ্যের উচ্ছ্বাসকে সে ফিরে পেতে চায়। জীবনের মহা মূল্যবান সময়কে ফিরে পেতে চান, এত কালের আহরিত জ্ঞান ও সঞ্চিত প্রাচুর্য্যের বিনিময়ে। সে উপলব্ধি করে মানুষের মুক্তিতো মৃত্যুতে নয়, বেঁচে থাকায়। জীবনের সাধনাতো সীমা ছাড়িয়ে অসীমে, অনন্তে। 'আমার বয়স যদি তিরিশ কি বত্রিশ হতো? এমন কি হতে পারেনা কোনো জাদুবলে আমি হয়ে গেছি যুবক? যুবক হওয়ার বিনিময়ে আমি দিতে পারি আমার এত কালের আহরিত জ্ঞান। আমি আমার যৌবন ফিরে পেতে চাই।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ২০৬) জামিলের তারুণ্যে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয় অকালের প্রেম। প্রাকৃতিক ভাবেই প্রেম কি অকালের? না প্রেমের কোন কাল নেই। প্রেম মহাকালের, মানুষের শাশ্বত, অনন্ত কালের সম্ভাবনা ও শক্তির উদ্বোধন। মহাকালব্যাপী আদিমতার মধ্যে মানুষের চৈতন্য দৌড় – এখানেইতো ব্যষ্টির সমষ্টি হয়ে ওঠা। জামিলেরও আদিম জৈবিক চৈতন্য জেগে উঠেছে এই প্রৌঢ়ত্বে। জামিলের জীবন ছিল কখনো বিকশিত, অর্ধবিকশিত, কখনো মুকুলিত। হঠাৎ একটি ফোন কল জামিলের জীবনকে ফুলের মতো প্রস্ফুটিত করে দিয়েছে। আর সেই ফোনটি করেছেন নুসরাত নামের এক তরুণী। যার মধ্যে ঢেউ খেলছে যৌবনের প্রমত্তা স্রোত, সমুদ্রের উত্তাল বীচি। জামিল সেই তরুণীর একটি ফোনের অপেক্ষায় প্রহর গুণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। 'তিনি অভীষ্ঠ টেলিফোন-কলটির আশা ত্যাগ করে লাইটের সুইচ অফ করতে গেলেন। হটাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। তিনি ছুটে এসে রিসিভার তুললেন পরিচিত কণ্ঠস্বর, যে কণ্ঠস্বর শোনার জন্য এই কটি দিন তিনি ব্যাকুল হয়ে ছিলেন। চাতক পাখির মতো তৃষিত।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ২০২) জামিল নুসরাত আমানের প্রেমে পড়েছে। সে মনে মনে বলে 'লাইফ বিগিনস্ এ্যাট ফিফ্‌টি। জীবন পঞ্চাশ বছরে শুরু হয়।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ২২৩) নুসরাতও পঞ্চাশোর্ধ জামিলকে জীবনসঙ্গী করতে চায়। এই বয়সেও জামিলের দেহ মনে বয়ে যায় রোমান্টিকতার কৃত্রিম যৌন সুখ। তাঁরা নিয়ম করে বিকেলে ঘুরতে বেরোয়। জামিল মাঝে মাঝে চুম্বন নিবেদন করে নুসরাতের ওষ্ঠে। 'এসো নিই বিদায় চুম্বনে' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ২২৪) এই রোমান্টিক মুহূর্তে সুপার ইম্পোজিসন খেলে যায় নুসরাতের মনে। মনে পড়ে যায় সাবেক প্রেমিক হারুনের কথা। 'আমার চোখে মুখে কি অতীত প্রকাশিত।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ২২১) আরো মনে পড়ে তাঁদের প্রণয়াসক্তির সুখকর স্মৃতি। একদিন বৃষ্টিমুখর দিনে নুসরাত আবদ্ধ হয়েছিল হারুনের বাহুবন্ধনে – 'আলিঙ্গনে কেঁপে ওঠে নুসরাত। সবকিছু এলোমেলো করে দেয়া এক ঝড় ওদের দু' জনকে জাপটে ধরে। নুসরাত অনুভব করে, একজন পুরুষ ওর ভেতরে প্রবেশ করছে প্রবল ভাবে। সে উন্মীলিত হচ্ছে ফুলের মতো, সে গলে যাচ্ছে জলের মতো, সে ভেসে যাচ্ছে, মদির উত্তাপ ওকে জড়িয়ে ধরেছে। ঝড়ের অবসান হারুন আর নুসরাত ক্লান্ত হয়, বিচ্ছিন্ন হয়।' (শামসুর রাহমান ২০০৭ : ২২২)

এই উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রেম, হতাশা, নিঃসঙ্গতা এবং মনোজাগতিক বিষয়সমূহ যেমন স্থান করে নিয়েছে ঠিক তার মধ্যেও রাষ্ট্র ও সমাজ-ভাবনাও খণ্ডিত চরিত্রের উপকাহিনি হিসেবে উপনীত হয়েছে। তারুণ্যের উচ্ছ্বাস যেমন উপন্যাসে প্রতিভাত হয়েছে, তেমনি মধ্যবিত্তের নানা অনুষঙ্গও চিরচেনা পাখিদের মতো ডেকে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। হারুন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। হারুন তারুণ্যের প্রতীক। হারুনের পিতা ছিল শান্তি কমিটির সদস্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর পিতাকে মেরে ফেলে। কিন্তু হারুন একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছে এবং দেশের পক্ষ হয়ে সশরীরে যুদ্ধ করেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু দেশ কি তার আর্থ-সামাজিক শোষণ বঞ্চণার বৃত্ত ভাঙতে পেরেছে?

> হারুন মুক্তিযোদ্ধা ছিল বলে হারুনের জন্য সে গৌরব বোধ করেছে, ... যখন হারুন উৎপীড়িত বোধ করতো দেশের দুর্দশার জন্যে। মুক্তিযুদ্ধের চার মূলনীতির বিপর্যয় দেখে, একাত্তরের ঘাতকদের উৎপাত দেখে, পঁচাত্তরের হত্যাকারীদের দাপট দেখে বিমর্ষ আর বিপন্ন বোধ করত যখন হারুন, তখন ভারি সুন্দর লাগত ওকে! এই-ই-যদি হবে দেশের অবস্থা, স্বাধীন বাংলাদেশের অবস্থা, লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তস্নাত বাংলাদেশের হাল-তাহলে ওর পিতা কেন প্রাণ হারালেন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে? তিনি তো একা দালাল ছিলেন না, তাঁর চেয়ে অনেক বেশি তুখোড়, শয়তান দালালেরা এখনো বহাল তবিয়তে আছে এই চিন্তা নুসরাত জানে হারুনকে কুরে কুরে খেতো।
> (মো: মোস্তাফিজুর রহমান ২০০৯ : ১১)

পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে এই ভূণ্ডের মানুষের ক্রম-মুক্তি এবং অগ্রগতি ছিল অসম্ভব। রাজনৈতিক ও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনে নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিল অনিবার্য এবং তা অর্জন করেছে এই জাতি। স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভিন্ন বিপর্যয়, শাসকগোষ্ঠীর ব্যর্থতা, সামাজিক অস্থিতিশীলতা, গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অক্ষমতা, উপর্যুপরি সামরিক শাসন তচনছ করে দিয়েছে সমাজকাঠামো এবং মানুষের প্রত্যাশা।

আশির দশকের প্রত্যেক তরুণের প্রত্যাশার কথা হারুনের আত্মকথনের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। হারুন সেই বৃত্ত ভাঙতে চেয়েছিলেন। সে বৃত্ত ভেঙে বাইরে আসার জন্য উন্মুখ ছিল। ফলে অনেকের কাছে সেই বৃত্ত ভাঙার কৌশলটি অপরিণত অগ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে। কিন্তু তারুণ্যের ধর্ম বৃত্ত ভাঙার চেষ্টা। সেই চেষ্টা লেখক, হারুনের ক্ষোভের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। জাতীয় রাজনীতির প্রভাব কখনো কখনো মানুষের অধিকারবোধ ও দ্রোহ চেতনার প্রেরণাশক্তি হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা উত্তর কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে সামগ্রিক স্বপ্ন-ভঙ্গের ট্রাজেডি বিস্তার লাভ করে, *এলো সে অবেলায়* উপন্যাসে তা দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন ঔপন্যাসিক।

বাংলাদেশের অধিকাংশ উপন্যাসে প্রধান উপকরণ হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। শামসুর রাহমানের উপন্যাসও এদিক থেকে ব্যতিক্রম নয়। তাঁর

উপন্যাসে প্রধান উপজীব্য হয়ে এসেছে ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনবোধ। বিশেষ করে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় যে অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় মধ্যবিত্ত মানসে আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা ও অস্তিত্বসংকট প্রকট আকার ধারণ করে। সেইসব সংকট ছড়িয়ে পড়ে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ চিন্তা–চেতনায়, ফলে তাঁরা হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ, স্বপ্নচারী ও আত্মকেন্দ্রিক। এই মনোজাগতিক সংকট প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে; যা মধ্যবিত্ত সমাজে বসবাসরত ব্যক্তিকে করে অস্থির, অন্তঃসারশূন্য ও অন্তর্মুখী।

গ্রন্থপঞ্জি

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৫)। *কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর: ১৯২৩-১৯৯৭*, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা

২. আমিনুর রহমান সুলতান (২০০৩)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩. খান মাহবুব (২০১২)। *বই বইমেলা ও প্রকাশনা*, আহমদ পাবলিশিং, ঢাকা

৪. *জাতীয় বীমা নীতি-২০১৪* (২০১৭)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বীমা শাখা, ঢাকা

৫. ফজলুল হক সৈকত (সম্পা. ২০১৭)। *ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য*, ভাষা প্রকাশ, ঢাকা

৬. বদিউজ্জামান খান (১৯৯৭)। *সংস্কৃতির রাজনীতি*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা

৭. বাংলা একাডেমি (২০১০)। *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা

৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা

৯. ভূঁইয়া ইকবাল (১৯৯১)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজ চিত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১০. মইদুল হাসান (১৯৮৬)। *মুলধারা '৭১*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

১১. মুনতাসির মামুন (২০০০)। *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, তৃতীয় সংস্করণ, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা

১২. মো: মোস্তাফিজুর রহমান (২০০৯)। *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ন*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা

১৩. রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১৪. শামসুর রাহমান (২০০৭)। *উপন্যাস সমগ্র*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা